সপ্তম পরিচ্ছেদ

পুরাকীর্তি

কিংবদন্তীতে আচ্ছন্ন মালদহের প্রাচীন ইতিহাস অস্পষ্ট। অনেকের মতে, কালিন্দ্রী ও মহানন্দার মিলনস্থলে অবস্থিত একসময়ের মলদ রাজ্য থেকে মালদহ নামের উৎপত্তি।[১] চতুর্থ শতাব্দীতে মেগাস্থিনিস এই এলাকাকে মালেন্দা বলে উল্লেখ করেছেন।[২] ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'-তে মালদহ নামটি প্রথম ব্যবহৃত হয়।[৩] সেটি সম্ভবত আজকের পুরাতন মালদহ। কাগজে-কলমে মালদহ জেলা সৃষ্ট হয় ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে।[৪] তার আগে এই জেলার উত্তর অংশ পুর্নিয়া ও দিনাজপুরের অধীনে এবং দক্ষিণ অংশ রাজশাহি জেলার অধীনে ছিল। দেশবিভাগের সময় মালদহ জেলা ছিল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে বলে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭-এর ১৭ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী মালদহ জেলা দ্বিখণ্ডিত হয়। ১৫টি থানার মধ্যে শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল, গোমস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ চলে যায় পূর্ব-পাকিস্তানে এবং বাকি দশটি থানা ইংরেজবাজার, মালদহ কালিয়াচক, মানিকচক, গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা, হরিশচন্দ্রপুর, খরবা ও রতুয়া এ দেশের মালদহ জেলাতেই থেকে যায়। পরে কালিয়াচক ভেঙে জেলার একাদশ থানা বৈষ্ণবনগর তৈরি হয়েছে। টাঙন-তীরবর্তী বরিন্দের গাজোল কার্যত উত্তরপূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার।

মহাভারতের পুণ্ড্র রাজ্যের সীমা প্রসঙ্গে মহানন্দা নদীর উল্লেখ আছে। কাজেই বর্তমান মালদহ জেলার খানিকটা পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

ঐতিহাসিকদের মতে, প্রাচীন রাজধানী-নগর পুণ্ড্রবর্ধন পরে পাণ্ডুয়ায় পরিণত হয়।[৫] রাজা অশোকের ভাই বীতশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন। এখানে থাকার সময় পাণ্ডুয়ার এক গোয়ালা তাঁকে জৈন ভেবে হত্যা করেন। গুপ্ত বংশের পৈতৃক ভিটা ছিল এই জেলায়। গৌড়ের প্রথম সার্বভৌম রাজা শশাঙ্কের রাজত্বে মালদহ ছিল তাঁরই বিচরণক্ষেত্র। কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিণী'-তে মালদহ জেলার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় মেলে।[৬]

মালদহের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায় পাল রাজত্ব থেকে। সেন যুগের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী ছিল মালদহ জেলাতেই। কুতুবুদ্দিন আইবকের সেনাপতি মহম্মদ বখতিয়ার খলজি গৌড়ের লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট হুমায়ুন গৌড়-নগরী দখল করে তার নাম রাখেন 'জন্নতাবাদ' অর্থাৎ স্বর্গীয় নগর। শের শাহের প্রধান কর্মচারী তাজউদ্দিনের ভাই সুলাইমান কররানি অস্বাস্থ্যকর গৌড় ত্যাগ করে টাঁড়ায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় অজস্র দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করেন। মালদহের টাঁড়া থেকে রাজমহলে রাজধানী সরিয়ে নেন মানসিংহ। ওলন্দাজদের পর ইংরেজরা ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে মালদহে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করে।[৭] মুসলিম-পূর্ববর্তী যুগের মালদহের বেশির ভাগ পুরাকীর্তিই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিছু পুরাবস্তু মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। মালদহ জেলার পুরাকীর্তিগুলি মূলত গৌড়, পাণ্ডুয়া, ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদহকেন্দ্রিক।

মালদহ জেলা থেকে এ যাবৎ তিনটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এরমধ্যে দুটি টাঙন-তীরবর্তী এলাকা থেকে। প্রথমটি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে খালিমপুর থেকে মিলেছে। এটির প্রবর্তক ছিলেন ধর্মপালদেব। দ্বিতীয়টি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর গাজোলের জাজিলপাড়া গ্রাম থেকে উদ্ধার করেন ক্ষিতীশচন্দ্র বর্মন। তাম্রলিপিটি রাজা দ্বিতীয় গোপালদেবের। এটি 'বর্মনলিপি' নামে পরিচিত। মালদহ মিউজিয়ামে লিপিটি সংরক্ষিত আছে।

১৯৮৭-এর ১৩ মার্চ হবিবপুরের জগজ্জীবনপুরের নিকটবর্তী তুলাভিটা থেকে তৃতীয় তাম্রশাসনটি পাওয়া গিয়েছে। স্থানীয় যুবক জগদীশচন্দ্র গাইন এই তাম্রফলকটির আবিষ্কর্তা। ফলকটির একদিকে ৪০টি পংক্তি ও অন্যদিকে ৩২টি পংক্তি খোদাই করা আছে। সংস্কৃত ভাষায় নবম শতাব্দীর সিদ্ধমাতৃকা লিপিতে এই ফলকটি লেখা হয়েছে। নতুন রাজা মহেন্দ্রপালদেবের নাম এই প্রথম পাওয়া গেল। পাল বংশের ইতিহাসে চতুর্থ রাজা হিসেবে তাঁর নাম সংযোজিত হল। ১৯৯২ থেকে সেখানে উৎখননের কাজ শুরু হয়েছে। জগজ্জীবনপুরে পাঁচটি মুখ্য প্রত্নস্থলের সন্ধান মিলেছে। এগুলি হল : তুলাভিটা, আখরিডাঙা, নিমডাঙা, মাইভিটা ও লক্ষ্মীটিবি। এই সব এলাকায় উৎখনন করে ব্রোঞ্জনির্মিত মারীচী মূর্তি, পোড়ামাটির সিলমোহর, পোড়ামাটির ফলক, নকশাযুক্ত ইট, মৃৎপাত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। নবম শতাব্দীর একটি বর্গাকার বৌদ্ধবিহার এখানে উন্মোচিত হয়েছে।

টাঙন-তীরের পুরাকীর্তির অন্যতম খনি গাজোল। এখানকার আদিনা, পাণ্ডুয়া, রানিগড়, দেওতলা, টুঙ্গিশহর প্রভৃতি এলাকার পুরাকীর্তি পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

১) বড় দরগা :

গাজোল থেকে ৩৪নং জাতীয় সড়ক ধরে ৮ কিমি গেলে ডান ধারে পড়ে বড় দরগা। মূল দরগা ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। জামি মসজিদ, ভাণ্ডারখানা, লক্ষ্মণসেনী দালান, তানুরখানা বা তন্দুরখানা, চাঁদ খাঁর সমাধি, হাজি ইব্রাহিমের সমাধি, চিল্লাখানা ও প্রাচীন এক পুকুর নিয়ে বড় দরগা। এই দরগা হজরত শাহ জালালউদ্দিন তাব্রিজির স্মৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত। মূল দরগাটির নির্মাতা সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ। পাণ্ডুয়ার প্রধান হিন্দু দেবালয় ধ্বংস করে দরবেশ তাব্রিজির নির্দেশে এটি বানানো হয় বলে অনুমান।[৮] দরগায় বহু হিন্দু ভাস্কর্যের নিদর্শন আজও অক্ষত হয়ে আছে। হিজরি রজব মাসের ২২ তারিখ থেকে এখানে এক সপ্তাহ ধরে মেলা চলে। অগণিত মানুষ মেলায় আসেন। এই মেলা এখন 'পাণ্ডুয়া-মেলা' নামে বিখ্যাত।

২) আসনশাহি ও সালামি দরওয়াজা :

বড় দরগা দেখার পর পিচরাস্তা ধরে গ্রামের দিকে এগোলে রাস্তার ধারে পড়ে সালামি দরওয়াজা। এটি বড় দরগার অংশ বিশেষ। ইটের তৈরি এই

প্রবেশদ্বারটি ২২ ফুট লম্বা ও ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া। এরই পাশে আছে খুব উঁচু বেদি - আসনশাহি। বলা হয়, দরবেশ এই বেদিতে বসে উপাসনা করতেন।

৩) ছোট দরগা :

এই দরগার অন্য নাম ছয় হাজারি দরগা। সুবাদার শাহ সুজা এই দরগাকে ছয় হাজার বিঘা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। আজও এর পিরোত্তর সম্পত্তি অক্ষত আছে। এখানে আছে পাণ্ডুয়ার খ্যাতনামা দরবেশ হজরত নুর কুতবুল আলম বা কুতুব-ই-আলমের সমাধি। কুতুবুল রাজা গণেশের পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন। ১৪২৭ সালে এটি নির্মিত।

৪) কুতুবশাহি মসজিদ :

ছোট দরগা থেকে খানিকটা এগিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে পির কুতুবুল আলমের সমাধি ও একলাখি ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে এই কুতুবশাহি সমজিদ, যার অন্য নাম সোনা মসজিদ। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদটি বানানো হয়। এর শীর্ষের গম্বুজগুলির চূড়াসমূহ সবুজ রঙের মিনা করা টালিতে ঢাকা ছিল। তাই এর নাম সোনা মসজিদ। এখন মিনা করা টালি ও গম্বুজ নেই।

৫) একলাখি সমাধি ভবন :

সোনা মসজিদের ১০০ মিটার উত্তর-পূর্বে একলাখি সমাধি ভবন রাস্তার বাম ধারেই। আটকোনা বুরুজবিশিষ্ট এক গম্বুজওয়ালা সমাধি ভবনটি ১৪১২-

১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। নির্মাণ-ব্যয় ছিল এক লক্ষ মুদ্রা। তাই এর নাম একলাখি ভবন। ভেতরে তিনটি সমাধি। এগুলি রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র যদু বা জালালউদ্দিন, তাঁর মুসলমান স্ত্রী ও পুত্রের। রাজা গণেশ এই ভবনের নির্মাতা। পাণ্ডুয়ার সেরা প্রত্ন-নিদর্শন এই একলাখি ভবন । এর টেরাকোটা কাজ দর্শনার্থীদের আজও মন্ত্রমুগ্ধ করে। ভবনটির আয়তন বর্গাকার। চারদিকেই দরজা আছে।

৬) আদিনা মসজিদ :

গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়া পিচরাস্তা ধরে একলাখি থেকে এক কিমি এগোলে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সংযোগ স্থলে প্রাচীন আদিনা মসজিদের অবস্থান। আদিনা মসজিদ বাংলার গৌরব। সুবিশাল এই মসজিদের ভগ্নাবশেষ ভ্রমণার্থীদের আজও বিস্ময়াবিভূত করে। ১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। সময় লাগে দশ বছর। এর নির্মাতা সুলতান ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ। হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কিংবা বৌদ্ধবিহারের অবশেষের উপর এই মসজিদ নির্মিত।[৯] এখানে ব্যবহৃত ইট, টেরাকোটা, পাথর ইত্যাদির অধিকাংশ হিন্দু মন্দির ভেঙে জোগাড় করা হয়েছে। আয়তনের দিক থেকে আদিনা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ। প্রার্থনাকক্ষটি আকর্ষণীয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল মূলকক্ষ। সামনের খিলান, ভল্টযুক্ত খিলান ও অলঙ্কৃত 'প্যাবাপেট' আজ আর নেই। এখানে পদ্মের মোটিফ, ঝুলন্ত লম্বা কারু-কার্যের মোটিফ, ঝুলন্ত শৃঙ্খল-প্রদীপ, জীবনবৃক্ষ, নাগদণ্ড, হংসতোরণ দর্শনীয়। উপসনাকারীদের ডানদিকে

একটি বেদি আছে। এখান থেকে ইমাম নমাজ পরিচালনা করতেন। কালো পাথরের তৈরি বেদিটি রাজ-সিংহাসনের আদলে বানানো।

• আদিনা মৃগদাব :

আদিনা মসজিদের সামনে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পূর্বে আদিনা বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে পিচ-ঢালা পথে দেড় থেকে দুই কিমি গেলে মৃগদাব দেখা যায়। রাজ্য বন বিভাগের অধীনস্থ এই অরণ্যে হরিণ ছাড়াও বিভিন্ন পাখি ও জীবজন্তু আছে। পরিযায়ী পাখিরাও এখানে আসে। আরণ্যক পরিবেশে নৌকাবিহারের ব্যবস্থা আছে। বনজ জলাশয়ে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ সংরক্ষণ করা হয়। পৌষ মাসে চড়ুইভাতির জন্য এখানে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ আসেন।

৭) টুঙ্গি শহর :

গাজোল থেকে ২০-মাইল হয়ে হরিরামপুরগামী পথে এগোলে উত্তর-পশ্চিমে তাহেরখানি গ্রাম। সেখানে অবস্থিত টুঙ্গি শহর। বেশ উঁচুতে অবস্থিত টিলার জন্য টুঙ্গি শহর নাম হয়ে আছে। স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষক হোপনা মার্ডি বাড়ি তৈরির পুরনো ভিত নির্মাণ করতে গিয়ে একটি বেদি আবিষ্কার করেন। এই বেদিতেই তাঁর পারিবারিক কালীপুজো হয়। একটি বিশাল মন্দিরে অলঙ্কৃত ও পার্শ্বদেব-খচিত পাথরের চৌকাঠ এখনও টুঙ্গি শহরের মাটিতে পড়ে আছে। লালমাটির নিচে থেকে উঁকি মারছে ইটের ভাঙা দেয়াল ও পশুমূর্তি। সংস্কারের সময় ১৯৭৭-এ বেরিয়ে এসেছিল হিন্দু আমলের কয়েকটি দেবদেবী ও

পশুমূর্তি। পাথরের দেবদেবীর ভাঙা হাত-পায়ের অংশ ও অজস্র খোলামকুচি এই এলাকায় ছড়িয়ে আছে।

৮) রাইখানদিঘি :

একলাখি স্টেশনের পশ্চিম-দক্ষিণ এলাকায় একটি বিশাল দিঘি দেখা যায়, এর নাম রাইখানদিঘি। কুষাণ যুগ থেকে মুসলিম আমল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের পুরারত্নসমৃদ্ধ লালমাটির প্রশস্ত পাড়যুক্ত এই দিঘি। শশাঙ্কের আমলে কর্ণসুবর্ণ থেকে যে-ধরনের ইট পাওয়া গেছে, সে ধরনের ইটে গাঁথা দেওয়াল রাইখানদিঘির পাড় থেকে আবিস্কৃত হয়েছে। এগারো শতকের টেরাকোটা ফুলদানি, পোড়ামাটির গুলতির গুলি ও খেলনা, পাথরের থালা, স্বর্ণ-আভাযুক্ত খোলামকুচি প্রভৃতির সন্ধান মিলেছে এই দিঘি থেকে। জগজ্জীবনপুরে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর সঙ্গে এগুলির মিল আছে। একটি খেলনা পুতুলের দিঘল নয়ন, শিরালরেখায় চিহ্নিত কেশবিন্যাস মিশরীয় বালিকার মতো অপূর্ব সুন্দর। মিনা করা তৈজসপত্রের ভগ্নাংশ মুসলিম আমলের সাক্ষ্য। দিঘির উত্তরে যে-দুটি ঢিবি আছে তা ধনা-মনার ঢিবি নামে পরিচিত।

হরিদাস পালিতের মতে, রাইখানদিঘির দক্ষিণ পাড়ে একটি বড় মাপের মন্দির ছিল। বুদ্ধদেব ধর্মোপদেশ দিতে রাইখানদিঘিতে একবার এসেছিলেন। আর সম্রাট অশোক এখানে একটি স্তূপ তৈরি করে দিয়েছিলেন। স্থানীয় গবেষক শান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরি এ মত সমর্থন করেছেন। প্রত্নবিদ সরসীকুমার সরস্বতী রাইখানদিঘি এলাকাকে সম্ভাবনাপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্র বলেছেন।[১০]

৯) রানিগঞ্জের রানিগড় :

রানিগঞ্জ বাজারের খানিকটা দক্ষিণে রানিগড়ের অবস্থান। টাঙনের পরিত্যক্ত খাতের উপর ইট, পাথর, চুন ও সুড়কিতে নির্মিত বিশাল সেতুর ভগ্নাবশেষ এখানে দেখা যায়। পূর্ব দিকে টাঙন মূলখাতে প্রবাহিত হয়েছে। এস কে সরস্বতীর ভ্রমণ পুস্তিকায় রানিগড়ের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হয়েছে। পাথরের চামুণ্ডামূর্তি, ফ্লোরাল ডিজাইনযুক্ত প্রস্তরফলক, প্রস্তর নির্মিত মন্দিরের কারুকার্য খচিত চৌকাঠ, বিভিন্ন মূর্তির ভগ্নাংশ দেখা যায়। রানিগড়ের সেতুর সঙ্গে যুক্ত সড়কটি পূর্ব দিকে বাংলাদেশের নাটোর ও দক্ষিণ-পশ্চিম হয়ে গৌড়নগরীর সঙ্গে এক সময় যুক্ত ছিল।

১০) নাসির শাহের দিঘি :

পাণ্ডুয়ার বৃহত্তর এলাকায় এক সময়ে এই দিঘিটি সংরক্ষিত ছিল। দিঘিটি কোনও হিন্দু রাজার খনন করা। মুসলিম আমলে এর সংস্কার করে এমন নামকরণ করা হয়েছে।

১১) সাতাশঘরা দিঘি :

আদিনার দু-কিলোমিটার পূর্বে সাতাশঘরা দিঘির অস্তিত্ব মেলে। তবে সাতাশঘর বা ষাটগম্বুজ বলে এখানে একটি রাজপ্রাসাদ ছিল। প্রাসাদে একটি আটকোনা বিশিষ্ট হামাম বা স্নানাগারের ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। কানিংহাম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এই স্নানাগারকে 'Turkish bath of the Palace' বলেছেন। দিল্লির অনুকরণে এই স্নানাগার তৈরি হয়েছিল। এতে দিল্লির গৌরব

খানিকটা ম্লান হয়ে যায়। এজন্য ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ দিল্লি থেকে বাংলা আক্রমণ করেন।[১১]

১২) দেওতলা :

সেখ জালালুদ্দিন তাব্রিজির স্মৃতিবিজড়িত একটি চিল্লাখানার জন্য দেওতলার খ্যাতি। গাজোল থেকে দশ কিলোমিটার উত্তরে এর অবস্থান। তাব্রিজি কিছুদিন এখানে বাস করেছিলেন। দেওতলার পূর্বনাম তাব্রিজাবাদ। হিন্দু আমলে এর নাম ছিল দেবস্থল। চিল্লাখানাটি কোনও দেবমন্দিরের উপরে নির্মিত হয় বলে অনেকের অনুমান। নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে কষ্টিপাথরের বেশ কিছু মূর্তি মিলেছে।

১৩) গাজোল থানাচত্বর :

গাজোল থানার কালীমন্দির ও বিষ্ণুমন্দিরে বেশ কয়েকটি প্রত্নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। কালীমন্দিরে সূর্য, মনসা ও বিষ্ণুমূর্তির ভাঙা অংশ আছে। বিষ্ণুমন্দিরে কষ্টিপাথরের একটি পূর্ণাবয়ব বিষ্ণুমূর্তি নিয়মিত পূজিত হয়। এখানেই দুর্গামন্দিরে আরেকটি বিষ্ণুমূর্তি রাখা আছে। শিবমন্দিরে একটি সূর্যমূর্তি ও একটি ব্রহ্মামূর্তি ঠাঁই পেয়েছে।

১৪) হবিনগর :

গাজোলের চাকনগরের হবিনগর গ্রামের রঙমহল থেকে প্রচুর পুরাতাত্ত্বিক

নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থানীয় প্রমীলা হাজরা বাড়ি তৈরির সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে প্রচুর প্রত্নবস্তুর সন্ধান পান। রাজমুকুট, তলোয়ার, ঢাল, ঘণ্টা, ফুলঝারি, সোনার থালা প্রভৃতি উঠে আসে সেখান থেকে। নানা ধরনের বৃহদাকার কৃপাণ মিলতে থাকে। এখান থেকে প্রাপ্ত সোনার পুতুল নিয়ে প্রতিবেশী গ্রাম ইমামনগরের সঙ্গে চাকনগরের সংঘর্ষ শুরু হয়। তিন মাস পুলিশ পিকেট বসে। গাজোল থানা প্রত্নবস্তু উদ্ধার করে আনে। কথিত আছে, রাজনগরের রাজার সঙ্গে পাশা খেলায় হবিনগরের রাজা হারতে হারতে শেষ পর্যন্ত রানিকে পণ ধরেন। তাতেও তিনি হেরে যান। এ কথা শুনে গলায় কলসি বেঁধে জলে ডুবে রানি আত্মঘাতিনী হন। এজন্য এখানকার পুকুরটির নাম রানিডোবা। এক সময় মরা টাঙনের সঙ্গে এই পুকুরের সংযোগ ছিল বলে জনশ্রুতি। বাণিজ্যের জন্য নৌকো ছিল। এখন তা পচে গেছে। পুকুরটির জল শুকোয় না। পুকুর থেকে কষ্টিপাথরের অনেক দেবমূর্তি মিলেছে। বেশির ভাগই বেহাত হয়ে গিয়েছে। চড়া দামে ভিনদেশে মূর্তিগুলি পাচার হয়ে গিয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বদ্ধমূল ধারণা।

১৪) জগজ্জীবনপুর :

হবিবপুরের জগজ্জীবনপুর এখন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের নজরের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৮৭ সালের ১৩ মার্চ এখানকার তুলাভিটায় স্থানীয় জগদীশচন্দ্র গাইনের কোদালের ডগায় ওঠে আসে একটি তাম্রশাসন। পালবংশের চতুর্থ রাজা মহেন্দ্রপালের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। তিনি দেবপাল-মাহাটার পুত্র। তাই

দেবপালের পর মহেন্দ্রপাল রাজা হন, শূরপাল নন।[১২] নবম শতকের এই তাম্রশাসনটির মূল বিষয় সেনাপতি বজ্রদেবের অনুরোধে বৌদ্ধ দেবতাদের পূজা ও ভিক্ষুদের উপসনার জন্য রাজা মহেন্দ্রপালদেবের জমি দান। এই জমি নন্দদির্ঘীকা মহাবিহারের কাছাকাছি অবস্থিত। ফলকে টঙ্গিল নামে একটি নদীর উল্লেখ আছে। নন্দদির্ঘীকা- উদ্রঙ্গ মহাবিহারের পূর্ব দিকে এই নদী প্রবাহিত বলে তাম্রফলকে খোদিত আছে। অনেকে এই নদীকে টাঙন বলে চিহ্নিত করলেও বাস্তবে টাঙন নদী এই মহাবিহারের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত। এখানকার বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে বিক্রমশীলা মহাবিহারের সাযুজ্য আছে। এখান থেকে ব্রোঞ্জনির্মিত বুদ্ধমূর্তি, পাথরের বুদ্ধমূর্তি, পোড়ামাটির ফলক, পোড়ামাটির সিলমোহর, নকশাযুক্ত ইট, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। ১৯৯২ থেকে খোঁড়া শুরু হলেও ১৯৯৬ থেকে বেশ জোরদারভাবে খননকার্য চলছে। তবু বিহারের ধ্বংসাবশেষ ও সংলগ্ন সম্ভাব্য আরও চারটি বিভাগ এখনও সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়নি। মালদহ প্রত্নশালায় একটি পৃথক কক্ষে জগজ্জীবনপুর থেকে ওঠে আসা প্রত্নসামগ্রী রাখা হয়েছে।

১৫) বানপুরের ঝাপড়ি কালী :

হবিবপুরের সিঙ্গাবাদ স্টেশনের প্রায় দেড় কিমি আগে রেললাইনের ঠিক পাশেই বানপুরের ঝাপড়ি কালীমন্দির। প্রাক স্বাধীনতা আমলের এই মন্দিরে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পুজো হয়। বৈশাখ মাসে ভিন-রাজ্যের মানুষও এখানে পুজো দিতে আসেন। চৈত্রের রামনবমীতে মহাধুমধাম করে পুজো হয় ও বিরাট

মেলা বসে। মায়ের থানটিতে দেখা যায় সিঁদুরচর্চিত একটি মাটির ঢিবি। কোনও মূর্তি নেই। ঢিবিতে পুজো করা হয়। পাশে অবস্থিত রুদ্রচণ্ডীদেবীর একটি বাঁধানো বেদি। অনেক পার্শ্বদেবতাও এখানে পূজিত হন। মন্দির চত্বরের মধ্যে পড়ে থাকা প্রস্তরনির্মিত দেবমূর্তির ভগ্নাবশেষ ও তার পাশে পুরোনো একটি পুকুর পাড়ে মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা প্রাচীন ইট ও প্রস্ত রখণ্ড প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করছে।

১৬) আইহো শিবমন্দির :

টাঙন যেখানে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে সেই মোহানার প্রাচীন বর্ধিষ্ণু জনপদ আইহো। এখানে দুটি শিবমন্দির আছে। মঠের গম্ভীরার শিবমন্দিরে চারটি শিবলিঙ্গ আছে। আর একটি জীর্ণ শিবমন্দিরেও আছে চারটি শিবলিঙ্গ। এই মন্দিরে কালো ব্যাসল্টের তৈরি একটি বিষ্ণুমূর্তি রাখা আছে।

১৭) <u>বুলবুলচণ্ডী</u> :

প্রায় এক শো বছর আগে এখানকার এক প্রাচীন পুকুর থেকে প্রস্ত রনির্মিত পালঙ্কে শায়িতা এক নারীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। মূর্তিটির কোলে একটি শিশু খোদিত আছে। মূর্তিটিকে লোকে চণ্ডীজ্ঞানে পুজো করতে শুরু করে। এইভাবেই বুলবুলি এলাকা পরিণত হয় বুলবুলচণ্ডীতে। বর্তমানে ওই মূর্তিটি বুলবুলচণ্ডী স্টেশন থেকে বাজারগামী রাস্তার একটি একতলা দালানে প্রতিষ্ঠিত

আছে। বৈশাখের প্রতি মঙ্গলবার অসংখ্য ভক্ত সমাগমে ধুমধাম করে পুজো হয়।

১৮) তিলাসন :

হবিবপুরের সীমান্তবর্তী এলাকা তিলাসন। উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম হিজলবন এখানে অবস্থিত। এই হিজলবন মুখ্যত কেউটে ও গোখরো সাপের চারণভূমি। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড চিতাবাঘ শিকারে এখানে এসেছিলেন। সে সময় জমিদার ভৈরবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে তিনি দেখা করে করমর্দন করেন। এডওয়ার্ডের সামনেই ভৈরবেন্দ্রবাবু গোবর আর গঙ্গাজল দিয়ে হাত ধুয়ে নেন। সম্প্রতি এখানে ভৈরবেন্দ্রবাবুর একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

১৯) শিবডাঙি :

এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গটি[১৩] এখানকার মন্দিরে অবস্থিত। বামনগোলার একটি যোগাযোগসংকুল গ্রাম শিবডাঙি। মালদহ জেলার প্রাচীনতম এই মন্দিরের শিবলিঙ্গটির উচ্চতা ১' ১০" ও ব্যাস ৪' ৯"। একটি প্রাচীন বটগাছের গোড়ায় এই মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটি তিলভাণ্ডেশ্বর শিবমন্দির নামে পরিচিত। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে জমজমাট মেলা বসে। ভাদ্র-পূর্ণিমাতেও পুজো অনুষ্ঠিত হয়। জরাজীর্ণ এই মন্দিরটির ভেতরের চারদিকে চুন-সুড়কি দিয়ে তৈরি ভুট্টার মোটিফ আছে।

২০) জগদলা :

রাজা রামপাল প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল মহাবিহারটি এখানেই অবস্থিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। তবে তার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে সংশয় আছে। এই চত্বরে প্রচুর ইটের টুকরো ছড়িয়ে আছে। একসময় বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল। বামনগোলার জামতলা থেকে দু-কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত এই গ্রামে একটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি মুসলিম-উত্তর যুগের তৈরি। রামপুকুর, শ্যামপুকুর, নলপুকুর, ঠাকুরপুকুর, চন্দ্রপুকুর প্রভৃতি নামে প্রচুর জলাশয়ের অবস্থান আছে এখানে। জগদলা থেকে প্রচুর প্রস্তর-মূর্তি মিলেছে।

২১) মদনাবতী :

বামনগোলার দক্ষিণ দিনাজপুর সীমান্তে মদনাবতীর অবস্থান। বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূচনা পর্বের লেখক উইলিয়াম কেরি নীলকুঠির দায়িত্ব নিয়ে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন এখানে আসেন। ছিলেন ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন পর্যন্ত।[১৪] স্কুল প্রতিষ্ঠা, আধুনিক কৃষি পদ্ধতির বিস্তার, চিকিৎসার প্রসার, বিজ্ঞানচেতনার বিকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কেরির অবদান বংশানুক্রমে স্মরণ করেন এখানকার মানুষ। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মদনাবতীতে বাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য তিনি যে-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তাতে দেশীয় শিক্ষা হিসেবে রামরাম বসু, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ও মোহন চন্দ যুক্ত ছিলেন। এখানেই কেরি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। মদনাবতীর মেঘডুমরাদিঘির পাশে নীলকুঠি ও নীলতৈরি কারখানার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কেরিপুত্র পিটারের সমাধিস্থল আছে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে কাঠের তৈরি একটি বাংলা মুদ্রণযন্ত্র এখানে স্থাপনের জন্য এনেছিলেন কেরি। কিন্তু ছাপা

শুরু করতে পারেননি। পরে যন্ত্রটিকে শ্রীরামপুর মিশনে স্থাপন করেন তিনি। বহুমুখী প্রতিভাধর কেরিকে স্মরণ করে প্রতি বছর ২৬ ডিসেম্বর এখানে কেরি মেলা বসে।

২২) পুরাতন মালদহ :

প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে পুরাতন মালদহের খ্যাতি। এখানকার জামি মসজিদ বিশেষ আকর্ষণীয়। শিলালিপিতে এই মসজিদকে ভারতের কাবা বলে অভিহিত করা হয়েছে। আকবরের সময়ে মসজিদটি নির্মিত হয়। সংস্কার হয় হোসেন শাহের আমলে। শাহ লঙ্কাপতির সমাধি, শাহ গদার দরগা, শাকমোহন মসজিদ, ফুটি মসজিদ, কাটরা ও পারাঢালা দিঘি এখানকার দর্শনীয় স্থান।

দুটি গুরুদ্বার আছে এখানে। একটি মঙ্গলবাড়ি রেলগেটের পাশে ও অপরটি পুরাতন মালদহে। পুরাতন মালদহের গুরুদ্বারে ধর্ম প্রচারের জন্য গুরুনানক এসেছিলেন। ১৪৬৮-'৬৯ খ্রিস্টাব্দে এখানে এসে তিনি সাড়ে তিন মাস অবস্থান করেন। তাঁর ব্যবহৃত তরবারি, স্নানের বালতি, মাটির কুঁজো ও কুয়ো এখনও আছে। গুরু তেগবাহাদুরও এখানে এসেছিলেন। তাঁর ব্যবহৃত বর্শা আছে এখানে ।

২৩) মোরগাঁ-মাধাইপুর :

বহু প্রাচীন একটি কালীমন্দির আছে। কথিত আছে, বল্লাল সেন চারটি দ্বার-অধিষ্ঠাত্রীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জহুরাচণ্ডী, পাতালচণ্ডী,

দ্বারবাসিনীচণ্ডী ও মাধাইচণ্ডী। মাধাইচণ্ডীর মন্দিরের ডানদিকে ফাঁকা আকাশের নিচে চারটি বৃহদাকার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের উল্টো দিকে সাতটি ঢিবিযুক্ত বাঁশুলির থান। স্থানীয়ভাবে এর নাম কাঁচা-খাকীর থান। মূল মন্দিরের ভেতরে বাঁধানো বেদির ওপর ছোট্ট উঁচু ঢিবি দেখা যায়। ওই ঢিবির উপরে কয়েকটি মুখোশ রাখা আছে। মহীপালদেবের রাজত্বের একটি বুদ্ধমূর্তি-সহ কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি এখান থেকে মিলেছে। এগুলি মালদহ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

প্রখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থপ্রণেতা ও হোসেন শাহের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী এখানে তাঁদের মাতুলালয়ে বাস করতেন বলে গ্রামটি আরও খ্যাতি পেয়েছে। রূপ ছিলেন হোসেন শাহের প্রতিরাজ (সগির মালিক) ও সনাতন ছিলেন প্রধান মুন্সি (দবির খাস)। সম্প্রতি রূপ-সনাতনের মন্দির নির্মাণে স্থানীয় মানুষেরা উৎসাহী হয়েছেন।

এসব ছাড়াও গোয়ালজয়ের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, দেউড়িয়ার ভাঙা স্তূপ ও নরবলির স্থান, বারো মাইলের কালীমন্দির, তেঁতুলবাড়ির শিবমন্দির, পাউলের পিরের দরগা, মহাপাউলের বুরুজ, বোদরার পিরের মাজার, বামনঘাটের প্রস্তরমূর্তি, রানিপুরে প্রাচীন পাথরের মূর্তি, ইচাহারে মালদহ জেলার প্রাচীনতম দুর্গাপুজোর আয়োজক জমিদারবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, গোবিন্দপুরের প্রাচীন দুর্গামণ্ডপ, নিত্যানন্দপুরের জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গামন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, তেনাপিরের তিন-সতিনের ঘাট প্রভৃতি টাঙন-

অববাহিকায় পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য বহন করছে। ১৯৯৯-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি হবিবপুরের মাণ্ডালু গ্রামে এক বিশাল প্রত্নঢিবি আবিস্কৃত হয়েছে।

এখানকার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত কষ্টিপাথর ও প্রাচীন পাথরে তৈরি দেবদেবীর প্রচুর মূর্তি মালদহ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে সূর্যমূর্তি ও বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যাই বেশি। প্রজ্ঞাপারমিতা, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি বৌদ্ধমূর্তি ও কয়েকটি দুর্লভ মূর্তি আছে এখানে। তবে উপযুক্ত নজরদারির অভাবে এক সময় টাঙন-তীরবর্তী অঞ্চল থেকে প্রচুর দুস্প্রাপ্য প্রত্নবস্তু পাচার হয়ে গিয়েছে। অন্য দিকে, খননের অভাবে অজস্র পুরানিদর্শন এখানকার মাটিতেই চাপা পড়ে আছে। লুকিয়ে আছে অনেক অজানা ইতিহাস। তাই এসব এলাকায় দ্রুত খনন কার্য শুরু হওয়া দরকার। ভ্রমণপিপাসুদের কথা মাথায় রেখে বরিন্দে পর্যটনক্ষেত্র গড়ে তোলাও জরুরি।

তথ্যসূত্র :

১. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি — প্রদ্যোত ঘোষ, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-১২ পৃষ্ঠা-০৩

২. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি — প্রদ্যোত ঘোষ, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-১২ পৃষ্ঠা-০৩

৩. জানা অজানার মালদহ — ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ম সংস্করণ, জানু. '০৬ মালদহ পৃষ্ঠা-০৮

৪. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ — কমল বসাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, এস পি পাবলিশার্স, মালদহ পৃষ্ঠা-০১

৫. গৌড়ের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)— রজনীকান্ত চক্রবর্তী। সম্পাদনা: ড. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ (জানুয়ারি ১৯৯৯) পৃষ্ঠা-৪২-৪৩

এবং

গাজোল গাইড — ২০০১, প্রকাশক: মৌমিতা ভার্মা, অ্যাড সেন্টার, গাজোল, মালদহ পৃষ্ঠা-০৪

৬. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ — কমল বসাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, এস পি পাবলিশার্স, মালদহ পৃষ্ঠা-১০

৭. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ — কমল বসাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, এস পি পাবলিশার্স, মালদহ পৃষ্ঠা-১০

৮. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি — প্রদ্যোত ঘোষ, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-১২ পৃষ্ঠা-৬৫

৯. গৌড়ের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড), —রজনীকান্ত চক্রবর্তী। সম্পাদনা: ড. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ (জানুয়ারি ১৯৯৯) পৃষ্ঠা-৪৩

১০. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ — কমল বসাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, এস পি পাবলিশার্স, মালদহ পৃষ্ঠা-৯১

১১. প্রবন্ধ: মালদা জেলার পুকুর-দিঘি-জলাশয়ের কথা — পুষ্পজিৎ রায়, গৌড় মালদা সংবাদ, শারদীয়া ১৪১০, মালদহ পৃষ্ঠা-১৫

১২. 'যুগান্তর' পত্রিকা, ১৫ মার্চ ১৯৯৪ ('মাটি খুঁড়তেই ইতিহাসের নতুন সংযোজন' শীর্ষক প্রতিবেদন— গৌরাঙ্গদেব ভার্মা)

১৩. মালদহ সমাচার, বর্ষ ১০৪, সংখ্যা ২, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ পৃষ্ঠা-০৬

১৪. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি — প্রদ্যোত ঘোষ, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-১২ পৃষ্ঠা-১০২